বিজ্ঞান অন্বেষক -এর গ্রাহক হোন। বার্ষিক গ্রাহক চাঁদা মাত্র ৬ টাকা। ডাকযোগে পত্রিকা পাঠানো হবে। বিজ্ঞান মনস্কতা গড়ে তুলতে আমাদের পাশে থাকুন।

বিজ্ঞান অন্বেষক

পত্রিকা যোগাযোগ
বিজ্ঞান দরবার–কাঁচরাপাড়া, চাকদহ বিজ্ঞান ও সাংস্কৃতিক সংস্থা, ত্রিবেণী যুক্তিবাদী সংস্থা, হরিণঘাটা অন্ধবিশ্বাস ও কুসংস্কার বিরোধী কমিটি, কোচবিহার–কাছারিমোড়, নীলকুঠি জলপাইগুড়ি— তপন সেন, সেন ফার্মেসী রেল বাজার আলিপুর দুয়ার জং বুকমার্ক ৬ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট কল-৭৩

বর্ষ -৫ | সংখ্যা ২ | মার্চ-এপ্রিল/২০০৮ | RNI No. WBBEN/03/11192 | দাম ১টাকা

মারি কুরি
এক অনন্য বিজ্ঞান সাধিকা

মারিয়া ক্লোদোৎস্কা (Maria Sklodowska)— যিনি পরে মারি কুরি (Curie, Marie–1867-1934) নামে পরিচিত হন; তিনি ওয়ারস (Warsaw) তে ০৭ নভেম্বর ১৮৬৭ খ্রিস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর বাবা হাইস্কুলের পদার্থবিজ্ঞানের শিক্ষক ছিলেন। তাঁর মাও উচ্চ শিক্ষিতা ছিলেন এবং তিনি মেয়েদের একটা প্রাইভেট স্কুল পরিচালনা করতেন। তাঁরা পাঁচ ভাই বোন ছিলেন। সে সময় ওয়ারস ছিল জার (Jsar) শাসিত রাশিয়ার অধীনে। যেহেতু জারের অনুমোদনে উচ্চশিক্ষা রুশ ভাষায় প্রচলিত ছিল; সেজন্যে ক্লোদোৎস্কাদের মতো স্বদেশ প্রেমিক পোলিশ (Polish) শিক্ষকদের জীবনে বিপদের ঝুঁকিও থাকত, যদি না তাঁরা এই আনুগত্য মেনে নিতেন। কিন্তু তবুও আপাতভাবে মারিয়ার বাবা জারের অসন্তোষের শিকার হন। ফলত তাঁদের পরিবারে এক বিষম দারিদ্র্যের ফলে নেমে আসে। এই দরিদ্রতার বলি হিসেবে মারিয়ার মা যক্ষ্মা রোগে আক্রান্ত হন। মারিয়ার বয়স যখন এগারো বছর, তখন তিনি মারা যান।

ছেলেবেলা থেকেই মারিয়ার প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায়। পাঁচ

এর পর ৬ পাতায়

পৃথিবীর উষ্ণায়ন ও জলবায়ু পরিবর্তন

গত সংখ্যার পর

সমুদ্রের বরফ : মেরু অঞ্চলে অতিরিক্ত ঠান্ডায় সমুদ্রজল জমে বরফ হয়ে যায়। সমুদ্রের ওপরে কয়েক মিটার পুরু এরকম বরফের স্তর দেখা যায়। যেখানে উষ্ণতা অত্যন্ত কম, মেরু অঞ্চলে সেখানেই সমুদ্রের ওপরে এরকম বরফ জমতে দেখা যায়। পৃথিবীর বায়ুমন্ডলে অত্যন্ত বেশি পরিমাণে গ্রিন হাউস গ্যাস মেশায় জলবায়ু পরিবর্তনের ইঙ্গিতটি মেরু অঞ্চলে সমুদ্রের এই বরফের স্তরের দিকে তাকালে স্পষ্ট বোঝা যেতে পারে।

সুমেরু সাগরে ১৯৭০-এর দশকের মাঝামাঝি বরফের স্তরের যে গড় আয়তন ছিল ১৯৯০ দশকের শেষের দিকে তা প্রায় ১০ লক্ষ বর্গ কিলোমিটার কমে গেছে। সুমেরু সাগরে প্রতি দশকে প্রায় ২.৮ শতাংশ হারে বরফের গড় আয়তনটি কমেছে। পৃথিবীর উচ্চ অক্ষাংশে ঠিক এই সময়কালেই উষ্ণতা ক্রমশ বেড়েছে। **ইন্টার গভর্নমেন্টাল প্যানেল অন ক্লাইমেট চেঞ্জ** (আই পি সি সি, ২০০১) এর এক তথ্যে দেখা যাচ্ছে যে, ১৯৭৯ সাল থেকে ১৯৯৮ সালের মধ্যে সুমেরু সাগরের বরফস্তরের বিগলনের সময়কাল (যখন উষ্ণতা হিমাঙ্কের ওপর থাকে) ৫৭ দিন থেকে বেড়ে ৮১ দিন হয়েছে। ফলে একদিকে যেমন বেশি রফ গলেছে, অন্যদিকে তেমনই শীতকাল কম হয়ে যাওয়ায় বরফ জমার পরিমাণও কমেছে। শুধু যে সুমেরু সাগরে বরফস্তরের গড় আয়তন কমেছে তা-ই নয়। এটি বেশ পাতলা হয়েও এসেছে। ডুবোজাহাজ থেকে নেওয়া নানান তথ্যে দেখা যাচ্ছে যে সুমেরু সাগরের বরফস্তর বেশ কয়েক দশক ধরে তার আগের অবস্থার থেকে প্রায় ৪০ শতাংশ পাতলা হয়ে গেছে। অঙ্কের হিসেবে এটি প্রায় ২-৩ মিটার পাতলা হয়েছে। ওপরের এই ঘটনাগুলোই সুমেরু জুড়ে উষ্ণতা বৃদ্ধির সপক্ষে এক বড় প্রমাণ। সুমেরুতে এসব ঘটনা ঘটলেও কুমেরু সাগরে কিছু ১৯৭০ দশকের মাঝামাঝি সময় থেকে বরফস্তরের আয়তনে কোন হেরফের হয়নি। এমনকী এই বরফের স্তর আরও পাতলা বা পুরু হয়েছে কিনা তা-ও জানা যায়নি।

সমুদ্রের অন্তর্ভূপৃষ্ঠ উষ্ণতা : সমুদ্রজলের পৃষ্ঠভাগের উষ্ণতা মাপার পাশাপাশি ১৯৫০ সাল থেকে পৃথিবী জুড়ে সমুদ্রজলের উপরিভাগের প্রায় ৩০০ মিটার গভীরতা পর্যন্ত উষ্ণতাও নেওয়া হচ্ছে। এই উষ্ণতার তথ্য থেকে দেখা যাচ্ছে যে প্রতি দশকের সমুদ্রজলের ৩০০ মিটার গভীরতা

এর পর ২ পাতায়

ভারতে কৃত্রিম উপগ্রহ গবেষণার ৫০ বছর

৪ঠা অক্টোবর ১৯৫৭। মস্কোর ঘড়িতে তখন রাত ১০টা বেজে ২৮ মিনিট ৪ সেকেন্ড। দক্ষিণ-পূর্ব রাশিয়ার একটি জনশূন্য প্রান্তর থেকে উড়ে গেল রকেট R সেভেন, স্পুটনিককে সঙ্গে নিয়ে। নব্বই মিনিট পর স্পুটনিকের রেডিও ট্রান্সমিটার থেকে ২০ ও ৪০ মেগা হার্ৎজ কম্পাঙ্কে বিপ্ বিপ্ বিপ্ আওয়াজ ছড়িয়ে পড়তে লাগল মহাশূন্যে। স্পুটনিক জানিয়ে দিল যে সে কক্ষপথে স্থাপিত হয়েছে। পৃথিবীকে আবর্তন করতে শুরু করেছে। এই স্পুটনিক পৃথিবীর সর্বপ্রথম কৃত্রিম উপগ্রহ (Artificial Satellite)। স্পুটনিক উৎক্ষেপণের মধ্য দিয়ে শুরু হল মহাকাশ যুগ (space age)। এতদিন যা ছিল কল্পবিজ্ঞানের বিষয় তা হয়ে উঠল মানুষের বাস্তব অর্জন। বিংশ শতাব্দীর যে কটি আবিষ্কার আমজনতাকে বিশেষভাবে নাড়া দিয়েছিল, তার অন্যতম অবশ্যই স্পুটনিক। পুরো নাম স্পুটনিক-ওয়ান।

তারপর থেকে একের পর এক কৃত্রিম উপগ্রহকে মহাকাশে ছুঁড়ে দিচ্ছে রাশিয়া, আমেরিকা, জাপান প্রভৃতি দেশ। ভারত স্থির দর্শক হয়ে

এর পর ৫ পাতায়

পৃথিবীর উষ্ণায়ন ও জলবায়ুর পরিবর্তন

১ পাতার পর

পর্যন্ত উষ্ণতাও নেওয়া হচ্ছে। এই উষ্ণতার তথ্য থেকে দেখা যাচ্ছে যে প্রতি দশকে সমুদ্রজলের ৩০০ মিটার গভীরতা পর্যন্ত উষ্ণতা বেড়েছে প্রায় ০.৩৭° সেলসিয়াস বা বিগত ৫০ বছরে মোট উষ্ণতা বেড়েছে প্রায় ০.১৮° সেলসিয়াস। আপাতদৃষ্টিতে উষ্ণতার এই বৃদ্ধিকে খুবই কম মনে হলেও ব্যাপারটি মোটেও হেলাফেলার নয়। কারণ, যেহেতু জলের তাপ ধারণের ক্ষমতা অত্যন্ত বেশি, উষ্ণতার এই বৃদ্ধিটুকুই সমুদ্রের তাপ ভান্ডারটিকে ক্রমশ বাড়িয়ে তোলে।

জলবায়ু পরিবর্তনের অন্যান্য প্রমাণ : কিছু দীর্ঘস্থায়ী প্রাকৃতিক, জৈবিক ও রাসায়নিক পদার্থের ওপর অতীত জলবায়ু পরিবর্তনের নানা ছাপ পড়ে যায়। জলবায়ু পরিবর্তনের অতীত নিদর্শন হিসেবে এরা খুবই গুরুত্বপূর্ণ যেহেতু অনেক ক্ষেত্রেই আধুনিক যান্ত্রিক উপায়ে তথ্য সংগ্রহের অনেক আগের তথ্য এখান থেকে মেলে। অতীত এ সব নিদর্শনকে বলে জলবায়ু প্রতিনিধি (ক্লাইমেট প্রক্সি)। বেশ উল্লেখযোগ্য এরকম কিছু প্রতিনিধির আলোচনা নিচে করা হল।

বৃক্ষবলয় : গাছের বৃদ্ধির এক বার্ষিক চক্র আছে। এই বৃদ্ধির ছাপ তাদের কান্ডের ভেতরে বলয়ে থেকে যায়। বসন্তকালে গাছ তাড়াতাড়ি বাড়ে। এ সময় গাছের কান্ড বা কাঠ হয় হালকা রঙের। শীতকালে গাছের বৃদ্ধি কমে যায়। ফলে কাঠের রঙও হয় বেশ গাঢ়। গাছ সাধারণত উষ্ণ বছরগুলোতে বেশি বাড়ে। ফলে চওড়া বৃক্ষবলয় উৎপন্ন হতে দেখা যায়। যে কোন গাছের বার্ষিক বলয় থেকে তাই সে বছরের জলবায়ুর তথ্য পাওয়া যায়। দীর্ঘজীবী কোন গাছের বলয়গুলি থেকে অতীত উষ্ণতার এক স্পষ্ট ছবি পাওয়া যায়। কোন নির্দিষ্ট অঞ্চলে বৃক্ষবলয়ের প্রস্থ ও উষ্ণতার সম্পর্কের ভিত্তিতেই সাধারণত বর্তমান ও অতীত দিনের উষ্ণতা হ্রাস-বৃদ্ধির প্রবণতাটি বোঝা যায়।

এখানে একটি কথা বলা জরুরি যে জলবায়ুর অন্যান্য বৈশিষ্ট্যগুলোও, (যেমন— বৃষ্টিপাতের প্রভাব) নিশ্চিতভাবেই গাছের বৃদ্ধিকে প্রভাবিত করে। বৃক্ষবলয় থেকে তাই কেবলই যে তাপমাত্রার তথ্যটি আলাদা করে পাওয়া যাবে, তা নয়।

তুষারকেন্দ্র : হিমবাহের মধ্যে গর্ত খুঁড়ে কয়েক ইঞ্চি ব্যাস বিশিষ্ট বরফের যে স্তম্ভ তুলে আনা হয়, তাকে বলে তুষারকেন্দ্র। তুষারপাতের ফলে যে সময়ে হিমবাহ সৃষ্টি হয়েছিল, হিমবাহের বরফের রাসায়নিক ও ভৌত অবস্থা তার নানান তথ্য দেয়। হিমবাহের বরফ যখন জমতে থাকে তখন তার মধ্যে ছোট বুদবুদ সৃষ্টি হয়। এই বুদবুদগুলো থেকে সে সময়ের আবহাওয়ার রাসায়নিক গঠনের পুরো তথ্য পাওয়া যায়। যদি কোন হিমবাহের বরফস্তরে এই বুদবুদ না থাকে তাহলে বুঝতে হবে যে ওই বরফ সৃষ্টির সময়ে উষ্ণতা বেশ ভালরকম ছিল যার জন্য বরফের ওপরের স্তর গলে গেছে। এছাড়াও, বরফের রাসায়নিক গঠন, বিশেষ করে হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন এর ভারী আইসোটোপ এর ভগ্নাংশ থেকেও, হিমবাহটি যখন সৃষ্টি হয়েছিল তখনকার উষ্ণতার পরিমাপ করা যায়। এমনকী বরফ কেলাসগুলোর আকার ও বিন্যাস থেকেও সে সময়ের উষ্ণতার তথ্য পাওয়া যায়। বরফে ধুলোবালির পরিমাণ দেখে বরফ জমার সময়ের আঞ্চলিক জলবায়ুর শুষ্কতা ও আর্দ্রতা বোঝা যায়। শুষ্ক জলবায়ুতে স্বভাবতই বরফে বেশি ধুলো জমবে।

অগ্ন্যুৎপাতের ফলে সালফার বাতাসে মেশে। বাতাসে মিশে গেলে এটি বৃষ্টির সঙ্গে মিশে সালফিউরিক অ্যাসিডে পরিণত হয়। এই সালফিউরিক অ্যাসিড হিমবাহের ওপরে তুষারপাত বা বৃষ্টিপাতের সঙ্গে পড়ে। তাই হিমবাহের অম্লতার পরিমাপ করে বোঝা যায় যে এর বরফ জমার সময়ে কোনরকম বড় অগ্ন্যুৎপাত হয়েছিল কি না।

কুমেরু ও গ্রিনল্যান্ড এর বরফ কেন্দ্রের বুদবুদ ও আইসোটোপ এর নানান পরিমাপ থেকে বিগত ৭,৪০,০০০ বছরের উষ্ণতার তথ্য পাওয়া গেছে। সাম্প্রতিকতম বরফ কেন্দ্রের তথ্যে দেখা গেছে যে বাতাসে যে সময়ে কার্বনডাই-অক্সাইডের পরিমাণ বেশি থেকেছে তখনই উষ্ণতাও বেশি হয়েছে। হিমযুগে কার্বনডাই-অক্সাইডের মাত্রা থেকেছে সর্বনিম্ন। আর হিমযুগ পরবর্তী উষ্ণ যুগে এই মাত্রা হয়েছে সর্বোচ্চ। ৬০,০০০ বছর আগে থেকে ১৮,০০০ বছর আগে পর্যন্ত শেষ হিমযুগ ছিল। এই সময়ে বাতাসে কার্বনডাই-অক্সাইডের পরিমাণ ছিল ১৯০-২২০ পি পি এম। ১৮,০০০ বছর আগে এই পরিমাণটি বেড়ে দাঁড়ায় ২৬৫ পি পি এম। এর পর থেকে বিগত ১৯০০ সাল পর্যন্ত বাতাসে কার্বনডাই-অক্সাইডের পরিমাণ স্বাভাবিক উষ্ণতায় যে রকম থাকার কথা (২৬০-২৮০ পি পি এম) ছিল, বিগত ১০০ বছরের মধ্যে এটি হঠাৎ বেড়ে দাঁড়ায় ৩৭০-৩৭৯ পি পি এম যা বিগত ৭,৪০,০০০ বছরের ইতিহাসে কখনও হয়নি। প্রাক্-শিল্পবিপ্লব সময়ে বাতাসে কার্বনডাই-অক্সাইরডের পরিমাণ ছিল ২৭০-২৮০ পি পি এম। বাতাসে কার্বনডাই-অক্সাইডের পরিমাণ বৃদ্ধির ১৯৬৯-৭১ সালের গড় উষ্ণতা ১৩.৯৯° সেলসিয়াস থেকে ১৯৯৮-২০০০ সালে বেড়ে হয়েছে ১৪.৪৩° সেলসিয়াস। আই পি সি সি-র (২০০১) প্রতিবেদন থেকে জানা গেছে যে বর্তমানে বাতাসে এই হারে কার্বনডাই-অক্সাইডের পরিমাণ বৃদ্ধিতে ১৯৬৯-৭১ সালের গড় উষ্ণতা ১৩.৯৯° সেলসিয়াস থেকে ১৯৯৮-২০০০ সালে বেড়ে হয়েছে ১৪.৪৩° সেলসিয়াস। আই পি সি সি-র (২০০১) প্রতিবেদন থেকে জানা গেছে যে বর্তমানে বাতাসে যে হারে কার্বনডাই-অক্সাইড মিশছে তা বজায় থাকলে এই শতাব্দেই বাতাসে কার্বনডাই-অক্সাইডের পরিমাণ ৫০০ পি পি এম ছাড়াবে। আই পি সি সি-র প্রতিবেদনে এমনও আশঙ্কা করা হয়েছে যে ক্ষেত্রবিশেষে মাত্রাটি ৭৫০ পি পি এম-ও হতে পারে। প্রতি বছরে বর্তমানে বাতাসে কার্বনডাই-অক্সাইড বাড়ার পরিমাণ প্রায় ১.৮৪-২ পি পি এম।

প্রবাল : প্রবাল এক ধরনের ছোট সামুদ্রিক প্রাণী। এরা দলবদ্ধভাবে মূলত ক্রান্তীয় অঞ্চলে উষ্ণ সমুদ্র জলে জন্মায়। এরা এক প্রকার প্রাচীরের গায়ে আটকে থাকে। এই প্রবাল প্রাচীরটি তৈরি আগেকার প্রবালের কঙ্কাল দিয়ে। এগুলো কয়েক হাজার বছরের পুরনো হতে পারে। প্রবাল প্রাচীরের রাসায়নিক গঠন থেকে অতীত জলবায়ু ও সামুদ্রিক অবস্থার নানান তথ্য, যেমন— সমুদ্রজলের উষ্ণতা, বৃষ্টিপাতের পরিমাণ, লবণতা, সমুদ্রতলের উচ্চতা, ঝড়ঝঞ্ঝা, সমুদ্রে কী পরিমাণ মিঠাজল এসে মেশে ইত্যাদি জানা যায়।

সামুদ্রিক অবক্ষেপ : প্রতি বছর সমুদ্রের বুকে কয়েক বিলিয়ন টন অবক্ষেপ

এরপর ৩ পাতায়

পৃথিবীর উষ্ণায়ন ও জলবায়ুর পরিবর্তন

২ পাতার পর

জমা হয়। এই অবক্ষেপের মধ্যে ছোট সামুদ্রিক প্রাণীর দেহ কঙ্কাল থাকে। এদের কিছু প্রজাতি জন্মায় উষ্ণ জলে। কিছু জন্মায় শীতল জলে। সামুদ্রিক অবক্ষেপে তাই নির্দিষ্ট প্রজাতির দেহ কঙ্কালের আধিক্য দেখে সমুদ্রজলের উষ্ণতার তথ্য পাওয়া যায়। এ ছাড়া সামুদ্রিক অবক্ষেপ থেকে সমুদ্রজলের লবণতা, জলে অক্সিজেনের পরিমাণ, নিকটবর্তী মহাদেশীয় বৃষ্টিপাতের পরিমাণ, বায়ুর গতি ও দিক, জলে পুষ্টির পরিমাণ ইত্যাদি নানান তথ্য পাওয়া যায়।

ভূছিদ্র : ভূপৃষ্ঠ থেকে মাটির নিচে গভীর ও সরু গর্ত খুঁড়ে (ভূছিদ্র) তাপমান যন্ত্রের সাহায্যে বিগত কয়েক শতকের ভূপৃষ্ঠের উষ্ণতার ইতিহাস জানা যায়। উত্তর আমেরিকা এবং ইউরেশিয়াতে এরকম বেশ কিছু ভূছিদ্র আছে। আফ্রিকা, দক্ষিণ আমেরিকা ও অস্ট্রেলিয়াতে আছে অল্প কয়েকটি। ভূছিদ্র থেকে পাওয়া উষ্ণতার অতীত তথ্য থেকে জানা গেছে যে বিংশ শতাব্দে পৃথিবী জুড়ে ভূপৃষ্ঠের গড় উষ্ণতা বেড়েছে ০.৫° সেলসিয়াস। ১৫০০ সাল থেকে ধরলে এই বৃদ্ধির পরিমাণ প্রায় ১° সেলসিয়াস। বিগত পাঁচটি শতকের মধ্যে বিংশ শতাব্দই যে সবচেয়ে উষ্ণ ছিল এ তথ্যও ভূছিদ্র থেকে মিলেছে। এখানে উল্লেখযোগ্য যে ভূছিদ্রের সাহায্যে উষ্ণতার পরিমাপ কেবলই ভূপৃষ্ঠের উষ্ণতাকেই নির্দেশ করে। মাটির উপরিভাগে বায়ুমন্ডলের উষ্ণতার কোন পরিমাপ এ থেকে পাওয়া যায় না।

উপগ্রহের মাধ্যমে উষ্ণতার পরিমাপ : ১৯৭৯ সাল থেকে আবহাওয়া উপগ্রহগুলোর সাহায্যে পৃথিবীর উষ্ণতার তথ্য পাওয়া যাচ্ছে। এক বিশেষ ধরনের উপগ্রহ যন্ত্র— **মাইক্রোওয়েভ সাউন্ডিং ইউনিট (এম এস ইউ)**-এর মাধ্যমে বায়ুমন্ডলের নানান উচ্চতার উষ্ণতা মাপা যায়। যেহেতু এই উপগ্রহটি গোটা পৃথিবী জুড়েই উষ্ণতা মাপতে পারে তাই এর সাহায্যে পৃথিবীর গড় উষ্ণতা মাপা বেশ সহজ। এম এস ইউ-এর সাহায্যে সমুদ্র এবং জনমানবশূন্য অঞ্চলেরও উষ্ণতা মাপা সম্ভব। মোট ১২টি এম এস ইউ এখন মহাকাশে কাজ করছে। এর একটি দুর্বলতা হল যে এটি সুদূর অতীত দিনের কোন তথ্য দিতে পারে না।

পৃথিবীর উষ্ণায়নে মানুষের দায় কতটা : ওপরের আলোচনায় দেখা গেল যে, বিগত শতকে পৃথিবী উষ্ণ হয়েছে। উষ্ণতা বৃদ্ধির এই ধারাটি অবশ্য গত কয়েক শতাব্দ ধরেই চলছিল। এ কথা সত্যি যে বিংশ শতাব্দের পৃথিবীর উষ্ণায়নের অন্যতম কারণ হল মানুষের নানান কাজকর্মের ফলে বেরোনো গ্রিন হাউস গ্যাস। তবে এটাও খতিয়ে দেখা দরকার যে এরাও কতটা দায়ী উষ্ণায়নের জন্য। পৃথিবীর ইতিহাসের দিকে তাকালে দেখা যাবে যে অতীতেও জলবায়ুর পরিবর্তন ঘটেছে মানুষের কোনরকম প্রভাব ছাড়াই। প্রায় ১০ কোটি বছর আগে পৃথিবীতে অতিকায় ডাইনোসরদের রাজত্ব ছিল। তখন পৃথিবী কিন্তু এখনকার থেকেও উষ্ণ ছিল। সুমেরু ও কুমেরুতেও বরফের কোন লেশমাত্র ছিল না। আর যেসব গাছ এখন ক্রান্তীয় অঞ্চলে জন্মায়, তারা উচ্চ অক্ষাংশে তখন জন্মাত। আবার, ২০,০০০ বছর আগে পৃথিবী এমন ঠান্ডা হয়ে গেল যে কয়েক হাজার ফুট পুরু বরফের চাদরে উত্তর আমেরিকা ঢেকে গেল। এ সবের পিছনে মানুষের তো কোন হাতই ছিল না। কিন্তু, গত একটি বা দুটি শতাব্দ ধরে মানুষের কাজকর্মের পরিধি এতটাই বেড়েছে যে বাতাসে ক্রমাগত কার্বনডাই-অক্সাইড সহ নানান গ্রীন হাউস গ্যাস বেরিয়ে মিশছে। এই সময়ে কার্বনডাই-অক্সাইড এর ঘনত্ব বেড়েছে প্রায় ৩০ গুণ। অন্যান্য গ্রীন হাউস গ্যাসও প্রায় একইরকম বা বেশি বেড়েছে। ভৌত বিজ্ঞানের স্বাভাবিক নিয়ম অনুযায়ী এর অন্যতম ফল পৃথিবীর উষ্ণায়ন। নিচু অক্ষাংশের তুলনায় উঁচু অক্ষাংশে এবং গরমকালের তুলনায় শীতকালে উষ্ণায়ন বেশি হয়।

১৯৭০ সাল থেকে দ্রুত উষ্ণায়ন শুরু হয়েছে। এর আগে ১৯৫০ থেকে ১৯৭০ সালের মধ্যে পৃথিবীর গড় তাপমাত্রা কিছুটা কমেছিল। উষ্ণায়নের ক্ষেত্রে বাতাসে সালফার মেশা এক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। বায়ুমন্ডলের জলীয় বাষ্পের সঙ্গে বিক্রিয়া করে সালফার বাতাসে বাসমান খুব ছোট কণা সৃষ্টি করে। এদের বলে অ্যারোসল। দুই ধরনের অ্যারোসল আছে। কালো কার্বন অ্যারোসল (ঝুলের ছোট কণা দিয়ে তৈরি) সূর্যকিরণ ও অবলোহিত রশ্মি শোষণ করে। ফলে ভূপৃষ্ঠ ক্রমশ উষ্ণ হয়ে ওঠে। অপর একপ্রকার তরল সালফেট অ্যারোসল সৌরকিরণকে বিকিরিত করে মহাশূন্যে ফেরত পাঠায়। ফলে ভূপৃষ্ঠ ঠান্ডা হয়। বিংশ শতাব্দের মাঝামাঝি সময়ে পৃথিবীর গড় তাপমাত্রা কমার এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ। এই সময়ে বাতাসে কার্বনডাই-অক্সাইড মেশার পরিমাণ ক্রমশই বাড়লেও উষ্ণায়ন কখনোই তরল সালফেট অ্যারোসল দ্বারা আগত সৌরকিরণের বিকিরণজনিত উষ্ণতা হ্রাসকে ছাপিয়ে যায়নি। ১৯৭০এর দশক থেকেই এই ছবিটা পাল্টে গেল। বাতাসে কার্বনডাই অক্সাইড মেশার পরিমাণ সালফারকে ছাপিয়ে গেল। ফলে উষ্ণায়নও তাড়াতাড়ি হতে থাকল। আই পি সি সি (২০০১)-ও তাদের প্রতিবেদনে জানিয়েছে যে ১৯৫০-২০০০ সাল পর্যন্ত মানুষের নানা কাজকর্মে বাতাসে অত্যন্ত বেশি পরিমাণে গ্রিন হাউস গ্যাস বেশায় উষ্ণায়ন ঘটেছে।

উষ্ণায়নের অন্যান্য সম্ভাব্য কারণ

পৃথিবীর কক্ষগত পরিবর্তন : পৃথিবীর কক্ষপথ সম্পূর্ণ গোলাকার নয়। এটি উপবৃত্তাকার। সময়ের সঙ্গে এই পথটি বদলায়। কক্ষপথের তিনটি অতি গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন দেখা যায়। প্রথমত, পৃথিবী ও সূর্যের মধ্যে দূরত্ব ধীরে বাড়ে ও কমে। এই হ্রাস-বৃদ্ধির চক্র পূর্ণ হতে ১ লক্ষ বছর লাগে। দ্বিতীয়ত, পৃথিবী বছরের কোন একটা সময় সূর্যের খুব কাছে চলে আসে। এই সময়টাও নির্দিষ্ট নয়। বর্তমানে উত্তর গোলার্ধের শীতকালে পৃথিবী সূর্যের খুব কাছে থাকছে। কিন্তু আগামী ১০,০০০ বছরের মধ্যে উত্তর গোলার্ধের গ্রীষ্মকালে পৃথিবী সূর্যের সবচেয়ে কাছে থাকবে। তৃতীয়ত, বর্তমানে পৃথিবীর মেরুরেখা তার কক্ষপথে প্রায় ২৩° হেলে সূর্যের চারপাশে ঘুরছে। প্রতি ৪০,০০০ বছরে এইরকম হেলে ঘোরার পরিবর্তন ঘটে ২২° থেকে ২৫° এর মধ্যে।

পৃথিবী ও সূর্যের মধ্যে গড় দূরত্বের পরিবর্তনে পৃথিবীতে আগত সৌরকিরণের পরিমাণের হেরফের হয়। জলাবায়ুর অন্যতম প্রধান নিয়ন্ত্রক যেহেতু সৌরশক্তি, তাই আগত সৌরকিরণের হেরফেরে জলবায়ু বদলে যায়। পৃথিবীর মেরু রেখার হেলে ঘোরার পরিবর্তনে নানান অক্ষাংশে (ক্রান্তীয় থেকে মেরু অঞ্চল পর্যন্ত) সূর্যের আলো পড়ারও তফাত ঘটে। এর ফলে জলবায়ু প্রভাবিত হয়। অতীতে কয়েক হাজার বছর ধরে পৃথিবীর চক্রাকার হিমযুগ ও অর্ন্তহিমযুগীয় উষ্ণ কাল এর ফলেই ঘটেছে।

এরপর ৪ পাতায়

পৃথিবীর উষ্ণায়ন ও জলবায়ুর পরিবর্তন

৩ পাতার পর

এখানে মনে প্রশ্ন জাগতে পারে যে তাহলে কি গত শতকের উষ্ণায়ন তথা জলবায়ুর পরিবর্তনও এভাবেই হয়েছে? না। কখনোই নয়। কারণ পৃথিবীর কক্ষগত পরিবর্তনের ফলে জলবায়ু বদলের পদ্ধতিটি অতি ধীর। এটা ঘটতে হাজার হাজার বছর সময় লাগে।

ভূগাঠনিক ক্রিয়া : ভূগাঠনিক ক্রিয়ার ফলেও জলবায়ুর পরিবর্তন হতে পারে। ভূপৃষ্ঠে মহাদেশ ও পর্বতের অবস্থান ভূগাঠনিক ক্রিয়ার ওপর নির্ভরশীল। কোন ভূমিভাগ কতটা তুষারে ঢাকা তা নির্ভর করে মহাদেশের অবস্থানের ওপর। তুষারে ঢাকা অঞ্চল আগত সৌরকিরণ বিকিরণ করে। ফলে ভূমিভাগ যত বেশি তুষারে ঢাকা হবে, তত বেশি পরিমাণ সূর্যকিরণ বিকিরত হয়ে মহাশূন্যে ফেরত যাবে। অতি অল্পই ভূপৃষ্ঠে শোষিত হবে। ফলে জলবায়ুও হবে বেশ শীতল। অপরদিকে, নিরক্ষরেখার কাছাকাছি মহাদেশের অবস্থান হলে খুব অল্প অঞ্চলই তুষারে ঢাকা হয়। ফলে সূর্যকিরণ বেশি বিকিরিত না হওয়ায় এখানকার জলবায়ু উষ্ণ হয়।

মহাদেশ ও পর্বতের অবস্থানের পার্থক্যের ফলে বৃষ্টিপাতের হেরফের হয়। খোলা পাথুরে অঞ্চলে বৃষ্টি পড়লে এক ধরনের রাসায়নিক বিক্রিয়া হয়। এই বিক্রিয়ায় বায়ুমন্ডলের কার্বনডাই-অক্সাইড এর পরিমাণ কমে যায়। যত বেশি বৃষ্টি পাথুরে অঞ্চলে পড়বে, বায়ুমন্ডলের কার্বনডাই-অক্সাইড এর পরিমাণ তত কমবে। ফলত জলবায়ুও বদলাবে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে প্রায় ৪ কোটি বছর আগে ভারতীয় উপমহাদেশীয় পাতের সঙ্গে এশীয় মহাদেশীয় পাতের ধাক্কায় হিমালয় পর্বত ও সংলগ্ন তিব্বত মালভূমি গড়ে উঠেছিল। সদ্য গড়ে ওঠা এই পাথুরে অঞ্চলে সে সময় প্রবল বৃষ্টিপাত হয়। বৃষ্টিপাতের ফলে রাসায়নিক আবহবিকারে বায়ুমন্ডলের কার্বনডাই-অক্সাইড এর পরিমাণ খুব কমে গিয়েছিল। এর ফলে পরবর্তী তিন কোটি বছর পৃথিবীর জলবায়ু বেশ শীতল ছিল।

স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন ওঠে গত শতাব্দের উষ্ণায়ন কি এই ভূগাঠনিক ক্রিয়ার ফলে ঘটেছে? না। কারণ ভূগাঠনিক ক্রিয়া অত্যন্ত ধীরে ঘটে। একটি পর্বত গড়ে উঠতে বা কোন মহাদেশের সরে যেতে কয়েক কোটি বছর সময় লাগে।

অগ্ন্যুৎপাত : অগ্ন্যুৎপাতের ফলে বাতাসে ধুলো ও ছাই মেশে। বাতাসে মেশা ধুলো ও ছাই পৃথিবীর বুকে সূর্যের আলো আসতে বাধা দেয়। দেখা যায় যে, কোন বড় রকমের অগ্ন্যুৎপাতের পরের কয়েক বছর পর্যন্ত উষ্ণতা বেশ কম থাকে। এভাবে জলবায়ুর পরিবর্তন ঘটে। ১৮১৬ সালে উত্তর-পূর্ব আমেরিকাতে পরপর তিন বছর তিনটি বড় অগ্ন্যুপাত হয়েছিল। ফলে উষ্ণতা কমে গিয়ে সেখানে বছরে আর কোন গ্রীষ্মকালই আসেনি। ভারমন্ট-এ জুন মাসে বরফ পড়েছিল। গ্রীষ্মকালীন এই তুষারপাতে প্রচুর ফসল নষ্ট হয়েছিল। দেখা দিয়েছিল খাদ্যসংকট। জুন-এর পর শীতকালে তাপমাত্রা এত কমে গিয়েছিল (-৪০° সেন্টিগ্রেড) যে বহু মানুষ উত্তর-পূর্ব আমেরিকা ছেড়ে দক্ষিণদিকে চলে গিয়েছিল। গত শতকে পৃথিবী জুড়ে এমন কোন বড় ধরনের অগ্ন্যুৎপাত ঘটেনি যার ফলে উষ্ণায়ন কমতে পারে।

এল নিনো ও লা নিনা : দক্ষিণ প্রশান্ত মহাসাগরে দক্ষিণমুখী এক উষ্ণ ঘূর্ণিস্রোত দেখা যায়। এর নাম এল নিনো। আর একটি দক্ষিণমুখী শীতল ঘূর্ণিস্রোতও এখানে দেখা যায়। নাম লা নিনা। এ দুটির স্থায়িত্বকাল এক থেকে দুই বছর। এক অনির্দিষ্টকাল অন্তর এ দুটিকে পর্যায়ক্রমে দেখা যায়। ক্রান্তীয় পূর্ব প্রাশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে এল নিনোর প্রভাবে দক্ষিণ আমেরিকার পশ্চিম উপকূল ভাগ উষ্ণ হয়। এর ফলে পৃথিবী জুড়ে উষ্ণতা ও বৃষ্টিপাতের হেরফের ঘটে। পৃথিবীর গড় উষ্ণতা বৃদ্ধি পায়। লা নিনার বেলায় ব্যাপারটি ঠিক উল্টো হয়। পৃথিবীর গড় উষ্ণতা কমে যায়। বিগত বেশ কয়েক হাজার বছর ধরে জলবায়ুর পরিবর্তন দেখা গেছে। কখনো দেখা গেছে কোন শতাব্দের কয়েকটি দশকে উষ্ণতার পরিবর্তন ঘটেছে। আবার, হিমযুগ শুরু বা শেষের বেলাতেও এরকম ঘটেছে। জলবায়ুর এসব পরিবর্তন প্রকৃতির স্বাভাবিক নিয়মেই হয়েছে। ফলে দেখা গেছে যে বায়ুমন্ডল ও সমুদ্রের অবস্থা আবার দ্রুত স্বাভাবিক হয়েছে। এখনই আমাদের হাতে এমন কোন জোরালো তথ্য নেই যে যাতে করে আমরা দাবি করতে পারি গত শতকের উষ্ণায়ন বায়ুমন্ডল বা সমুদ্রস্রোত পরিবর্তনেরই ফল।

জলবায়ু বদলে গেলে কী হতে পারে : জলবায়ু বদলে গেলে অনেক কিছুর ওপরেই তার প্রভাব পড়তে পারে। মিঠাজল অমিল হতে পারে। খাদ্য উৎপাদনে হেরফের হতে পারে। মানুষের স্বাস্থ্য বিঘ্নিত হতে পারে। পৃথিবী জুড়ে প্রবল ঝড়, বন্যা বা খরা দেখা দিতে পারে। স্থান-কাল ভেদে বৃষ্টিপাত, আর্দ্রতা, বায়ুপ্রবাহ ও উষ্ণতার তফাত ঘটে ঋতু পরিবর্তন হতে পারে। উষ্ণায়নের প্রভাবে মেরুর বরফ গলে এবং সমুদ্রজলের তাপীয় প্রসারণের ফলে সমুদ্রতলের উচ্চতা ক্রমশ বৃদ্ধি পাবে। ক্রান্তীয় ঘূর্ণবাত, বিশেষ হারিকেন ও টাইফুন, উষ্ণায়নের ফলে আরও শক্তিশালী হবে। কারণ সমুদ্রপৃষ্ঠভাগের উষ্ণতার ওপর এদের তীব্রতা নির্ভর করে। সমুদ্রের তাপ ধারণ ক্ষমতা ভূমিভাগের থেকে অনেক বেশি বলে স্থলভাগ অনেক বেশি উত্তপ্ত হয়ে উঠবে। দিনের চেয়ে রাত, গ্রীষ্মের চেয়ে শীতকাল বেশি উষ্ণ হবে। দৈনিক ও বার্ষিক উষ্ণতার তফাত ক্রমশ কমে আসবে। ক্রান্তীয় অঞ্চলের তুলনায় উত্তর গোলার্ধে মধ্য ও উচ্চ অক্ষাংশীয় অঞ্চলের উষ্ণতা বেশি বৃদ্ধি পাবে।

সুমেরু ও সুমেরু বৃত্ত দেশীয় অঞ্চলের তাপমাত্রা অত্যন্ত বাড়বে। বিগত কয়েক দশক ধরেই এখানে তাপমাত্রা বাড়ছে। এখানে উষ্ণায়নের ফলে মেরুর বরফ আরও গলবে। সমুদ্রের বরফ গলে আরও পাতলা হবে ও পিছিয়ে যাবে। ফলে উপকূল অঞ্চলের ক্ষয় বাড়বে। সামুদ্রিক বাস্তুতন্ত্র বিপন্ন হবে। হ্রদ ও নদীয় জলে অল্পদিন বরফ থাকবে। বরফ যেহেতু ০° তাপমাত্রাতেও গলে যায়, একুশ শতকে তাই বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে বরফ গলার আশঙ্কা আছে। কারণ উষ্ণায়নের বর্তমান হারটি বজায় থাকলে ২০৮০ সাল নাগাদ সুমেরুর গ্রীষ্মকালে উষ্ণতা বাড়বে ৪°— ৭.৫° সেলসিয়াস। আর শীতকালে বাড়বে ২.৫° - ১৪° সেলসিয়াস।

এরপর আগামী সংখ্যায়

— রাহুল রায়, শিক্ষক ও পরিবেশ কর্মী

✆ ২৫৮৫-০৬৩৯
১ ঘণ্টায় রঙিন (ডিজিটাল) ছবি
ভিডিও ও স্টিল ছবির
জন্য আসুন—
স্টুডিও ইউনিক
কে.জি.আর.পথ, কাঁচরাপাড়া
(লক্ষ্মী সিনেমা, এলাহাবাদ ব্যাঙ্কের পাশে)

ফোন : ৯৭৩৩৩৭২১৮০
উত্তরবঙ্গে যোগাযোগ
আকুপাংচার চিকিৎসা কেন্দ্র
সুশ্রুত সেবা সংঘ
কোচবিহার বিজ্ঞান চেতনা ফোরাম
বাদুরবাগান চৌপথী
কোচবিহার

কৃত্রিম উপগ্রহ

১ পাতার পর

বসে থাকতে পারে না। ১৯৫৭-য় প্রথম কৃত্রিম উপগ্রহ উৎক্ষেপণের সময় থেকেই বিক্রম সারাভাই ভারতে মহাকাশ গবেষণার কাজ শুরু করেছিলেন। ইতিমধ্যে টাটা ইন্‌স্টিটিউট্ অব্ ফান্ডামেন্টাল রিসার্চের পক্ষ থেকে হায়দ্রাবাদের আকাশে বেলুন উড়িয়ে বায়ুস্তরের দুর্জ্ঞেয় রহস্য উন্মোচনের চেষ্টা হয়। এই পর্বে ভারতীয় বিজ্ঞানীরা গামা রে, এক্স রে, মহাজাগতিক বিকিরণ, রেডিও স্কাই মিরর, চৌম্বক ক্ষেত্রে সূর্যরশ্মির প্রতিফলন এবং বায়ুমন্ডলের চরিত্র সম্পর্কে গবেষণা শুরু করেন।

বর্তমানে ভারতই একমাত্র উন্নয়নশীল দেশ যে কৃত্রিম উপগ্রহের নকশা প্রস্তুতি, নির্মাণ, উৎক্ষেপণ এবং নিয়ন্ত্রণ করতে সক্ষম। টিভি ও রেডিও নেটওয়ার্কিং, টেলিযোগাযোগ, আবহাওয়ার প্রতি লক্ষ্য রাখা, বিপর্যয়ের পূর্বাভাস ও সতর্কতা, প্রাকৃতিক সম্পদের ব্যবস্থাপনার জন্য দূর সংবেদীক্রিয়া—এইসকল কাজই ভারতীয় উপগ্রহগুলি অনায়াসে করতে পারছে। ভারত এযাবৎ বিভিন্ন ধরনের ৩৮টি উপগ্রহ তৈরি করেছে। এর মধ্যে আছে অত্যন্ত উন্নতমানের INSAT-4 সিরিজের বহুমুখী ভূসমলয় উপগ্রহ। ১২টি উপগ্রহকে ভারতের নিজস্ব উৎক্ষেপন যান (Launch vehicle) দ্বারা উৎক্ষেপণ করা সম্ভব হয়েছে।

১৯৬৯ সালের ১৫ আগষ্ট ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল কমিটি ফর স্পেস রিসার্চ সংস্থাটি পুনর্গঠন করে ইন্ডিয়ান স্পেস রিসার্চ অর্গানাইজেশন (ISRO) গড়া হল। এটি ডিপার্টমেন্ট অব অ্যাটমিক এনার্জির অধীনস্থ একটি স্বশাসিত সংস্থা। ISRO-এর প্রতিষ্ঠাতা ড. বিক্রম সারাভাই। ভারতের মহাকাশ সম্পর্কিত যাবতীয় কর্মসূচীর পরিকল্পনা গ্রহণ করা এবং তা বাস্তবায়িত করাই ISRO-এর কাজ। রকেট ও কৃত্রিম উপগ্রহ নির্মাণ, উন্নয়ন, উৎক্ষেপণ, মনিটরিং এবং কৃত্রিম উপগ্রহের ব্যবহারগত বিষয়গুলির নিয়ন্ত্রণ ও কার্যকরী করা ISRO-র কর্মসূচির মধ্যে পড়ে।

মহাকাশ গবেষণার ইতিহাসে একটি স্মরণীয় দিন ১৯ মার্চ, ১৯৭৫। ঐদিন পূর্বতন সোভিয়েতের মাটি থেকে সোভিয়েত রকেটের সাহায্যে উৎক্ষিপ্ত হল ভারতের তৈরি ভারতের প্রথম কৃত্রিম উপগ্রহ আর্যভট্ট (Aryabhata)। আর্যভট্টের ওজন ছিল মাত্র ৩৫৮ কেজি। সেদিন পর্যন্ত ভারত মহাকাশ প্রযুক্তিতে কতটা অগ্রসর হয়েছে তা যাচাই করে নিতে চেয়েছিলেন ISRD -র বিজ্ঞানীরা। তাঁরা সফলও হয়েছিলেন। প্রায় ১৭ বছর ধরে আর্যভট্ট বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক তথ্য সরবরাহ করেছে।

আর্যভট্টের সফল উৎক্ষেপণের পর একের পর এক স্বনির্ভর উপগ্রহ উৎক্ষেপণের মাধ্যমে বৈজ্ঞানিক কৌশল অর্জনের ঐতিহাসিক ঘটনা ঘটে চলে। দূর উপলব্ধি (remote sensing), আবহমন্ডলের গতি প্রকৃতি অনুসন্ধান এবং যোগাযোগ সম্পর্কে অন্বেষণীয় কৃত্রিম উপগ্রহ তৈরি, তার বহুমুখী ব্যবহার এবং উপযোগিতার বিকাশ পর্যায়ে (১৯৭৫-৯৪) ভারতীয় বিজ্ঞানীরা উল্লেখযোগ্য দক্ষতার স্বাক্ষর রেখেছেন।

১৯৭৯ সালের ৭ জুন সোভিয়েত রকেটের মাধ্যমে উৎক্ষিপ্ত হল ভারতের দ্বিতীয় কৃত্রিম উপগ্রহ ভাস্কর-১। এর ওজন ছিল ৪৪৪ কেজি। এতে ছিল দুটি টেলিভিশন ক্যামেরা এবং তিনটি রিমোট সেন্সিং সেনসর। ১৯৮১ সালের ২০ নভেম্বর উৎক্ষিপ্ত হল অনুরূপ আর একটি উপগ্রহ ভাস্কর-২।

১৯৮০ সালের ১৮ জুলাই শ্রী হরিকোটা থেকে এস এল ভি-৩ রকেটের মাধ্যমে রোহিনী-১কে উৎক্ষেপণ করা হল। ১৯৮৩ সালের ১৭ এপ্রিল উৎক্ষেপণ করা হল রোহিনী-২।

ভারতের উপগ্রহ উন্নয়ন কর্মসূচীতে গুরুত্বপূর্ণ সময় ১৯৮১ সাল। ঐ বছরের ১৯ জুন ভারতের নিজস্ব তৈরি প্রথম যোগাযোগ উপগ্রহ APPLE (ARIANE PASSENGER PAY LOAD EXPERIMENT) কে সাফল্যের সঙ্গে ভূসমলয় কক্ষপথে (বিষুবরেখার উপরে ৩৬০০০ কিলোমিটার উচ্চতায়) স্থাপন করা হয়। টিভি প্রোগ্রাম রিলে, রেডিও নেট ওয়ার্কিং এবং যোগাযোগ সংক্রান্ত পরীক্ষা নিরীক্ষার কাজে APPLE-কে ব্যবহার করা হয়।

১৯৮৮ সালের ১৯ মার্চ তারিখে IRS (Indian Remote sensing) সিরিজের প্রথম উপগ্রহ IRS-1 (A) কে সোভিয়েত রকেটের সাহায্যে পোলার অরবিটে স্থাপন করা হয়। এরপর বিভিন্ন সময়ে IRS সিরিজের আটটি উপগ্রহকে মহাকাশে পাঠানো হয়।

আশীর দশকের শুরু থেকেই ভারতে টেলি যোগাযোগের ক্ষেত্রে এবং ঘরোয়া চাহিদা মেটানোর ক্ষেত্রে কৃত্রিম উপগ্রহের ব্যবহার ব্যাপকতা লাভ করে। ১৯৮৩ সালের ৩০ আগষ্ট টেলিযোগাযোগ উপগ্রহ INSAT-1 (B)-এর উৎক্ষেপণ সফল হয়নি। পরবর্তীকালে বিভিন্ন সময়ে INSAT সিস্টেমের বিভিন্ন সিরিজের উপগ্রহগুলি উৎক্ষেপণ করা হয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সাফল্য আসে। বর্তমানে INSAT টেলিকমিউনিকেশন নেটওয়ার্কে ছয়শ-র বেশি টেলিকমিউনিকেশন টার্মিনাল কাজ করছে। ৫০০-র বেশী রুটে ১০০০০-র বেশী টু-ওয়ে স্পিচ সার্কিট বর্তমান। INSAT-এর সাহায্যে সরকারী এবং বেসরকারী ক্ষেত্রে ৬০০০০-এর বেশী VSAT(Vvery small aperture terminal) কাজ করছে। VSAT হল আর্থ স্টেশনগুলোর বিকল্প ব্যবহার কার্যে নিরপেক্ষ এবং লিজ লাইন। দূরদর্শনের প্রায় ১০০টি চ্যানেল এবং প্রাইভেট চ্যানেলগুলি INSAT সিস্টেম ব্যবহার করছে। ভারতীয় ভূখন্ডের ৭০ শতাংশে ভারতের মোট জনসংখ্যার ৯৫ শতাংশ INSAT সিস্টেমের সুবিধালাভ করছে। ভারতের আবহাওয়া দপ্তর INSAT থেকে পাওয়া তথ্য ব্যবহার করে আবহাওয়ার পূর্বাভাস দিচ্ছে। সাইক্লোনের মতো প্রাকৃতিক দুর্যোগের পূর্বাভাস পাওয়া যাচ্ছে।

শিক্ষামূলক উদ্দেশ্যে তৈরি উপগ্রহ EDUSAT উৎক্ষেপণ করা হয় ২০০৪ সালের সেপ্টেম্বর মাসে। EDUSAT-এর মাধ্যমে একমুখী টিভি সম্প্রচার, ইন্টার অ্যাকটিভ টিভি, ভিডিও কনফারেন্সিং, কম্পিউটার কনফারেন্সিং পরিষেবাগুলি পাওয়া যাচ্ছে।

কৃত্রিম উপগ্রহের ব্যবহার ক্ষেত্র ক্রমশ: বৃদ্ধি পাচ্ছে। বিশেষ যোগাযোগ পরিষেবা, যেমন: মাল্টিমিডিয়া ব্রডকাস্ট, ব্রডব্যান্ড সার্ভিস, হাইডেফিনেশন টিভি; উপগ্রহ ভিত্তিক টেলিসার্জারি; শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের জন্য উদ্ভাবনমূলক যোগাযোগ মাধ্যম; মোবাইল যোগাযোগ— এসব ক্ষেত্রে কৃত্রিম উপগ্রহের সাহায্য নেওয়া হচ্ছে।

পরবর্তীকালে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন উদ্দেশ্যসাধক উপগ্রহ উৎক্ষেপণ হয়েছে। আগামী দশ বছরে উৎক্ষেপণ হবে, উপগ্রহের এমন তালিকাও দীর্ঘ। ভারতে কৃত্রিম উপগ্রহ সংক্রান্ত গবেষণা; কৃত্রিম উপগ্রহ নির্মাণ, উৎক্ষেপণ ও উপগ্রহের ব্যবহার ক্ষেত্রে ভারতীয় বিজ্ঞানী ও প্রযুক্তিবিদদের সাফল্য আজ উন্নত দেশগুলির কাছে ঈর্ষার বিষয়। — *গোবিন্দ দাস*

মারি কুরি

১ পাতার পর

বছর বয়স হবার আগেই তিনি পড়াশনো শুরু করেন। পড়াশুনোয় তাঁর অখণ্ড মনোযোগের কথা জানা যায়। তিনি পাঠ্যবই ছাড়া রোমাঞ্চকর গল্পের বই এবং টেকনিক্যাল নানারকম বই পড়তে ভালোবাসতেন। তিনি বাবা মায়ের কাছে ফরাসি এবং রুশ ভাষাও শেখেন। মারিয়া যখন হাইস্কুল থেকে পাস করেন, তখন তাঁর দিদি ব্রোনিয়া ও দাদা থোজিও-র মতো গোল্ড মেডেল পুরস্কার পান। সে সময় তাঁর বয়স ছিল ষোলো বছর। তাঁর বাবা অনেক চিন্তা-ভাবনা করে তাঁকে ছুটিতে এক আত্মীয়ের গ্রামের বাড়িতে পাঠিয়ে দেন।

এই সময়টা তাঁর জীবনে খুবই সুখের ছিল। তিনি এই সময়টা বনে বনে ঘুরে, ঘোড়ায় চড়ে, সাঁতার কেটে এবং নাচ-গানের মধ্যে দিয়ে খুশিতে অতিবাহিত করেন।...

এর অল্প কয়েকদিন পরেই মারিয়ার বাবা যখন তাঁর ভবিষ্যৎ কর্মপদ্ধতি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেন, তখন তিনি বলেন যে, প্যারিসে গিয়ে মেডিসিন (Medicine) নিয়ে পড়বেন। কিন্তু একথা শুনে তাঁর বাবা খুব বিষণ্ণ হয়ে পড়েন কারণ তাঁদের অর্থনৈতিক অবস্থা এত ভালো ছিল না যে তিনি মেয়েকে প্যারিসে পড়তে পাঠাতে পারেন। এদিকে তাঁর দিদি ব্রোনিয়াও একই ইচ্ছে পোষণ করেন। তখন তিনি ঠিক করেন যে ব্রোনিয়া ডাক্তারি পড়তে যাবে এবং তিনি ওখানে কাজ করে তাঁর দিদেকে সাহায্য করবেন; পরে দিদি ডাক্তার হয়ে গেলে, তাঁকে সাহায্য করবেন। সেই মতো তাঁর দিদি প্যারিসে চলে যান। মারিয়া ওয়ারসতে থেকে গেলেন এবং গভ্যার্নেস (Governess) হয়ে পড়াতে শুরু করেন। এরকম পড়াতে পড়াতে একবার তিনি এক পরিবারের বড়ো ছেলের প্রতি আকৃষ্ট হন। কিন্তু সেই পরিবারের অভিভাবকগণ ছেলের গভ্যার্নেসের সঙ্গে বিয়ে দিতে রাজি হলেন না। ভগ্নহৃদয়ে মারিয়া বাবার কাছে ফিরে আসেন এবং পোলিস গুপ্ত কলেজের শিক্ষিকা হিসেবে গণিতশাস্ত্র, পদার্থবিজ্ঞান ও রসায়ন বিজ্ঞান পড়াতে থাকেন। অবশেষে ১৮৯১ খ্রিস্টাব্দে দিদির আমন্ত্রণে প্যারিসের পথে যাত্রা করেন।

প্যারিসে সরবোন কলেজ (Sorbonne College)-এ মারি ক্লোদোৎসকা নামে তিনি ভর্তি হন। সেই সময় তাঁর দিদি এক তরুণ ডাক্তারকে বিয়ে করেন এবং তাঁদের এক সন্তানও হয়। সেজন্যে মারি তাঁদের ওপর বোঝা না বাড়িয়ে প্যারিসের স্টুডেন্টস' কোয়ার্টার (Students Quarter)-এর এক চিলতে ঘরে থাকতে শুরু করেন। সেই ঘরে তাপ ও জলের ব্যবস্থা ছিল না। শীতের সময় ঘর গরম করবার জন্যে স্টোভ বা একমুঠো কয়লা জ্বালানো ছাড়া অন্য কোনো উপায় ছিল না। এইভাবে দারিদ্র্য ও ক্ষুধাকে সারাক্ষণের সঙ্গী করে কলেজে চার বছর কাটান। একবার অনাহারে মারি অজ্ঞান হয়ে গেলে, তিনি তাঁর দিদিকে একথা জানান। তাঁর দিদি তাঁকে কাছে নিয়ে আসতে চান। কিন্তু দিদির ওপর তাঁর ভালোবাসা থাকা সত্ত্বেও তিনি তাঁর বাসস্থান পরিত্যাগ করেন না।

মারি ১৮৯৩ খ্রিস্টাব্দে মেডিসিনের বদলে পদার্থবিজ্ঞান নিয়ে পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করেন। এরপর একদিন তিনি তাঁর পোলিশ বন্ধু বিজ্ঞানী কোভালস্কির বাড়িতে যান। সেখানে এক তরুণ প্রতিভাবান পদার্থবিদ্ পিয়েরে কুরির (Curie, Pierre– 1859-1906) সঙ্গে পরিচিত হন। পিয়েরে কুরি এই সময় তাঁর ভাই (Jacqwues)-এর সঙ্গে পাইজোতড়িৎ (Piezoelectricity) এবং অল্প মাত্রার তড়িৎ প্রবাহ নির্ণয়ের জন্যে এক ধরনের নতুন যন্ত্র ইতিমধ্যেই উদ্ভাবন করেছেন। পিয়েরে ছিলেন আদর্শবাদী বিজ্ঞানী। তিনি কোনোরকম পদোন্নতি খুঁজে বেড়াতেন না। তিনি প্রখর ব্যক্তিত্বের অধিকারী এবং খুব আন্তরিক ছিলেন। কোনো মেয়ের প্রতি তাঁর বিশেষ কোনো আগ্রহ ছিল না। তিনি যখন সুন্দরী তরুণী মারির সঙ্গে পরিচিত হন তখন তাঁকে দেখে পিয়েরের ভালো লাগে ১৮৯৫ খ্রিস্টাব্দে তিনি মারিকে বিয়ের প্রস্তাব দেন। মারি সেই প্রস্তাব আনন্দের সঙ্গে গ্রহণ করেন। তাঁদের বিয়ে হয় ২৫ জুলাই ১৮৯৫ খ্রিস্টাব্দে। কিন্তু বিয়ে করেও মারির দারিদ্র দূর হলো না; কারণ প্যারিস মিউনিসিপ্যাল স্কুল অফ ফিজিক্স অ্যান্ড কেমিস্ট্রির শিক্ষক হিসেবে পিয়েরে কুরি মাসে ষাট ডলার মাইনে পেতেন। ১৮৯৭ খ্রিস্টাব্দে ভবিষ্যতের নোবেল প্রাইজ বিজয়িনী কন্যা আইরিন (Irene) এবং কয়েক বছর পরেই (১৯০৪ খ্রিস্টাব্দে) তাঁদের দ্বিতীয়া কন্যা ইভ (Eve) জন্মগ্রহণ করেন।

মারি কুরি ঘরের কাজের সঙ্গে বিজ্ঞানের গবেষণাও চালিয়ে যেতে থাকেন। সেই সময় ১৮৯৫ খ্রিস্টাব্দে রোন্‌জেন, উইহেল্ম কোনরাড (Roentgen, W.C.- 1845-1923) এক্স রশ্মি (X-rays) এবং ১৮৯৫ খ্রিস্টাব্দে বেকারল, হেনরি (Becquerel, Henri–1852-1908) ইউরোনিয়াম লবণ থেকে গামা রশ্মি (Gamma -rays)-এর মতো রশ্মি আবিষ্কার করেন। অন্যান্য বিজ্ঞানীরা এই নতুন আবিষ্কার সম্পর্কে আগ্রহী হয়ে ওঠেন। পিয়েরের সহযোগিতার মারিও এই সম্বন্ধে গবেষণা করতে মনস্থির করেন। পিয়েরের উদ্ভাবিত তড়িৎমাপন যন্ত্র দিয়ে তিনি দেখতে পান যে, অন্য কোন মৌলের ওপর বিক্রিয়া বা নির্ভর না করেই, শুধুমাত্র ইউরেনিয়াম (Uranium) থেকে এই বিকিরণ নির্গত হয়। তিনি এই ধর্মের নামকরণ করেন রেডিওঅ্যাকটিভিটি (Radioactivity)। এইবার মারি পরবর্তী গবেষণার দিকে এগোন। তিনি খুঁজতে শুরু করেন- আর অন্য কোনো মৌলের অনুরূপ ধর্ম আছে কিনা। — *স্বপন কুমার দে*

অবশিষ্টাংশ পরবর্তী সংখ্যায়

ফর্ম : IV

রেজিস্ট্রেশন অব নিউজপেপারস (সেন্ট্রাল) রুলস১৯৫৬-এর ৮ম ধারা অনুসারে নিম্নলিখিত তথ্যসমূহ প্রকাশ করা হচ্ছে :

১। **প্রকাশ স্থান** : ৫৮৫, অজয় ব্যানার্জি রোড,কাঁচরাপাড়া, উত্তর ২৪ পরগনা। পিন- ৭৪৩১৪৫

২। **প্রকাশকাল** : দ্বিমাসিক

৩। **প্রকাশক** : জয়দেব দে
৫৮৫, অজয় ব্যানার্জি রোড,কাঁচরাপাড়া, উত্তর ২৪ পরগনা। পিন- ৭৪৩১৪৫
নাগরিকত্ব : ভারতীয়

৪। **সম্পাদক** : শিবপ্রসাদ সরদার
কেডিয়াবাগান, জোনপুর, কাঁচরাপাড়া, উত্তর ২৪ পরগনা। পিন- ৭৪৩১৪৫
নাগরিকত্ব : ভারতীয়

৫। **মুদ্রক** : জয়দেব দে
স্ক্রীন আর্ট, ২০, নেতাজী সুভাষ পথ, কাঁচরাপাড়া, উত্তর ২৪ পরগনা।
নাগরিকত্ব : ভারতীয়

৬। **স্বত্বাধিকারীর নাম** : জয়দেব দে
৫৮৫, অজয় ব্যানার্জি রোড,কাঁচরাপাড়া, উত্তর ২৪ পরগনা। পিন- ৭৪৩১৪৫
নাগরিকত্ব : ভারতীয়

আমি জয়দেব দে এতদ্বারা ঘোষণা করছি যে উপরোক্ত তথ্যগুলি আমার জ্ঞান ও বিশ্বাসমতে সত্য।

তারিখ : ৮ মার্চ, ২০০৮

জয়দেব দে
প্রকাশকের স্বাক্ষর

সাপ নিয়ে কিছু কথা

আমাদের দেশ ভারত একটি ঘন জনবসতিপূর্ণ দেশ এবং পাশাপাশি ঘন সর্প বসতিপূর্ণ দেশ। সংস্কৃত ভাষায় সাপকে 'চক্ষু শ্রবা' বলা হয় যার অর্থ 'চক্ষু শ্রবা' অর্থাৎ সাপ চোখ দিয়ে শোনে, যদিও কথাটি সম্পূর্ণ ভুল। সাপের বহিঃকর্ণ অনুপস্থিত তবে অন্তঃ কর্ণ বর্তমান। এরা বায়ু মাধ্যমে শব্দ শুনতে না পারলেও মাটির কম্পন অনুভব করতে পারে। এব্যাপারে সাহায্য করে ভূসংলগ্ন নিম্ন চোয়াল।

সাপকে ঘিরে এখনও নানা কুসংস্কার প্রচলিত আছে সমাজে। আছে সাপের বিষ ওঠানো নিয়ে সাপুড়েদের অনেক নাম ডাক, সাধারণ মানুষের অর্থ নাশ ইত্যাদি। অনুন্নত দেশগুলিতে এখনও কেউ সাপের কামড়ে আক্রান্ত হলে তাকে ডাক্তারখানায় না নিয়ে 'সাপুড়ে খানা'য় নিয়ে যাওয়া হয়। তাঁরা নাকি শক্তিশালী সাপুড়ে বাঁশী দিয়ে দংশনকারী সাপকে ডেকে এনে আক্রান্ত ব্যক্তির শরীর থেকে বিষ বের করে নেন। দারুণ কৌশলে বাঁশী ঘুরিয়ে তাঁরা সাপের মনোযোগ বাঁশীর দিকে নিয়ে আসে এবং বাঁশীর তালে তালে সাপও তার মাথা নাচাতে থাকে, মাঝে মাঝে ফোঁস করে ওঠে। দর্শক মনে করে সাপুড়ে বাঁশী কাজ করছে। আগেই জেনেছি সাপেরা শুনতে পায় না, বাঁশীর ডাকে চলে আসার কোনো প্রশ্নই ওঠে না। বাঁশী বাজানোর সময় সাপুড়েরা মাটিতে পা দিয়ে আঘাত করে বলেই সাপ কম্পন অনুভব করে ফোঁস করে ওঠে— সাধারণ দর্শকেরা কিন্তু তা লক্ষ্য করে না।

বিজয়গুপ্তের 'মনসা মঙ্গল' প্রচারিত হওয়ার পর থেকেই ভারতে 'সর্পদেবী মনসা' ব্যাপক জনপ্রিয়তা অর্জন করে। সাপের কামড়ে মৃত ব্যক্তিকে বাঁচানোর উদ্দেশ্য সাধারণ মানুষ মনসা পূজা শুরু করে। বলা বাহুল্য কোনো ক্ষেত্রেই সাপের কামড়ে মৃত ব্যক্তিকে বাঁচানো সম্ভব হয়নি। সেক্ষেত্রে দেখা যায় ব্যক্তিটি বেঁচে উঠল সেক্ষেত্রে লোকটি আদৌ মৃত নয়, লোকটিকে নির্বিষ সাপে কামড়ানোর ফলে ভয়েই অজ্ঞান হয়েছিল। একটা কথা মনে রাখা দরকার, বিষ তোলা নিয়ে মিথ্যে প্রবঞ্চনা আইনত দণ্ডনীয় অপরাধ।

সাপের মাথায় মণি আছে— একথা আদৌ সত্য নয়, এটা কেবল রূপকথার গল্পেই শোনা যায়। প্রকৃতপক্ষে সাপের মাথায় মণির উপস্থিতি বা সম্ভবনা আজও প্রমাণিত হয়নি।

'দুধ কলা দিয়ে কালসাপ পোষা' বলে যে কথা প্রচলিত তা একটা ডাহা মিথ্যে কথা। দুধ সাপের খাদ্যের মধ্যে পড়ে না। মাংসাশী প্রাণী সাপ, কলা খাওয়ার লোক না। সাপকে পোষার ব্যাপারে বলি, সাপের মস্তিষ্ক খুবই অনুন্নত। নিজের ভালো ছাড়া কিছু বুঝতেই পারে না। তাকে যতই দুধ খাওয়ানো হোক না আঘাত পেলেই দংশন করে।

সাপের বিষকে ইংরেজীতে Venom বলে। বর্ণহীন বা হলদেটে বর্ণের বিষ সাপের মাথার বিষগ্রন্থি থেকে ক্ষরিত হয়ে বিষদাঁত বা Fang- এর মাধ্যমে শিকারের দেহে প্রবেশ করে। আজ প্রমাণিত যে, প্রত্যেক সাপেরই বিষ থাকে। যে সকল সাপের বিষগ্রন্থিতে বিষের পরিমাণ বেশি এবং যাদের বিষ দাঁত আছে তাদের উগ্রবিষ সাপ বলে। যেমন— গোখরো, কেউটে, কালাজ, শাঁখামুটি, চন্দ্রবোড়া, শঙ্খচূড় ইত্যাদি। এদের কামড়ে সঠিক সময়ে চিকিৎসা না করলে মৃত্যু অবধারিত। যে সকল সাপের বিষের পরিমাণ নগণ্য এবং বিষ দাঁত অনুপস্থিত, তাদের সাধারণত নির্বিষ সাপ বলা হয়। এদের কামড়ে মানুষ মারা যায় না। এদের দলে আছে কালনাগিনী, ঘরচিতি, দাঁড়াশ, হেলে, বেতআছড়া, ঢোঁড়া, পুঁয়ে, অজগর ইত্যাদি। যেসকল সাপের বিষদাঁত আছে কিন্তু যাদের বিষের পরিমাণ উগ্রবিষ সাপের তুলনায় বেশ কম, তাদের ক্ষীনবিষ বিষধর সাপ বলে। যেমন, মেটুলি, বঙ্করাজ, লাউডগা ইত্যাদি।

সাপের বিষ অম্লধর্মী এবং দুই বা ততোধিক প্রোটিনের মিশ্রণ। এতে কতগুলি টক্সিন (Toxin) তাকে যেমন— Neurotoxin, Haemotoxin, Myxotoxin ইত্যাদি। এই টক্সিন আমাদের রক্তের লোহিত কনিকা বিনষ্ট করে যার ফলে দেহে অক্সিজেন পরিবহন ব্যাহত হয় এবং শ্বাসকষ্টে মানুষ মারা যায়। সাপের বিষে Proteinase, Hyaluronidase, Transaminase, Acid phsphatase, Exopeptidases ইত্যাদি উৎসেচক এবং কিছু পরিমাণ জিঙ্ক (zn), সালফার (S), কপার (cu) বর্তমান। সাপের বিষ সাপের খাদ্য পাচনে সাহায্য করে। আমাদের খাদ্যনালী (Alementary canal) তে কোনো ক্ষত না থাকলে আমরা সাপের বিষকে উচ্চ প্রোটিন সমৃদ্ধ খাদ্য হিসাবে গ্রহণ করতে পারি।

কি করে বোঝা যায় বিষধর সাপে কামড়েছে? বিষহীন সাপ কামড়ালে অনেকগুলি দাঁতের দাগ অর্ধচন্দ্রাকার ভাবে থাকে। বিষধর সাপ কামড়ালে দুটি দাঁতের দাগ পরস্পরের থেকে ১ ইঞ্চি দূরত্বে অবস্থান করে। এক্ষেত্রে ক্ষতস্থান থেকে কালচে বর্ণের রক্তনির্গত হয় যা সহজে বন্ধ হয় না। ক্ষতস্থানে যন্ত্রণা হতে থাকে। রোগীর কখনও পেটে ব্যাথা বমি বমি ভাব অথবা বমি হতে পারে। কখনো প্রচণ্ড ঘুম পায়, আবার মল-মূত্র, থুতু এবং বমিতে রক্ত দেখা যায়। এই সকল লক্ষণগুলি প্রকাশ পেলে বুঝতে হবে বিষধর সাপে কামড়েছে।

সাপে কামড়ালে কি করা উচিত? সাপে কামড়ালে আহত ব্যক্তিকে আশ্বস্ত করে তার ক্ষতস্থান বার বার সাবান দিয়ে ধুয়ে অ্যান্টিসেপটিক দিয়ে ধুয়ে দিতে হবে। ক্ষতস্থানে ভাঙ্গা দাঁত থাকলে তুলে ফেলতে হবে। এরপর রোগীকে টিটেনাস ইনজেট করে হাসপাতালে নিয়ে যেতে হবে। সেখানে উপযুক্ত মাত্রায় স্যালাইনের মাধ্যমে AVS (Anti-venom serum) দেওয়া হয়।

গত বছর (২০০৭) আমাদের দেশে প্রায় আড়াই লক্ষ সাপের কামড়ের ঘটনা ঘটে যার মধ্যে প্রায় পঞ্চাশ হাজার মানুষের মৃত্যু ঘটেছে।

সাপের কামড়ে মৃত্যু কমাতে সাপ সম্বন্ধে সঠিক জ্ঞান প্রচার করতে হবে লোক সমাজে। সাপেরা ইচ্ছে করে কাউকে কামড়ায় না, যখন তারা ভয় পায় তখনই কামড়ায়। আমরা সাপের থেকে অবশ্যই নিজেদের রক্ষা করব সাপটিকে তাড়িয়ে বা অন্য কোনো উপায়ে কিন্তু কখনোই তাকে খুন করে নয়।

— মোসুমী সোমা দত্ত,
ছাত্রী, প্রাণীবিদ্যা

'বার্ড ফ্লু' কিভাবে মোকাবিলা করবেন

বার্ড ফ্লু কি ?

এটি একটি ভাইরাস ঘটিত রোগ, যা পোলট্রিতে হয়। পোলট্রি বলতে মুরগি, হাঁস, টার্কি, গিনি, ফাউল ও কোয়েল প্রভৃতি গৃহপালিত পাখিদের বোঝায়। আর্দ্র ও শীতল জলবায়ু এই রোগের উপযুক্ত ও আদর্শ পরিবেশ। পোলট্রি থেকে মানুষের এই রোগের সংক্রমণ ঘটতে পারে।

বার্ড ফ্লু রোগটি কিভাবে ছড়ায় ?

বার্ড ফ্লুর অন্য নাম এভিয়ান্ ইনফ্লুয়েঞ্জা (এইচ ৫ এন ১)। জঙ্গলের পাখিরা বিশেষত পেঁচা, কাক, পরিযায়ী পাখিরা এই ভাইরাসের বাহক। এরা নিজেরা এই ভাইরাস (অন্ত্রের মধ্যে) পৃথিবীর একপ্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত হয়ে নিয়ে যায়। যেসব পাখি এই ভাইরাসে আক্রান্ত হয়, তাদের লালা, নাক থেকে নিঃসৃত পদার্থ এবং বিষ্ঠার মধ্যে এই রোগের জীবাণু থেকে যায়। পরে এদের সংস্পর্শে কোন সুস্থ পাখি এসে পড়লে তারাও এই ভাইরাসে অর্থাৎ বার্ডফ্লুতে আক্রান্ত হয়ে পড়ে। জীবাণু বিজ্ঞানীদের মতে অ্যাভিয়ান ইনফ্লুয়েঞ্জা ভাইরাসের ১৫টি প্রজাতির সবকটিই পাখি বা মানুষের দেহে ইনফ্লুয়েঞ্জা বা ফ্লু বাধায়। এদের মধ্যে এইচ ৫ এন ১ সবচেয়ে মারাত্মক কারণ, পরিবেশের খুব সামান্য পরিবর্তনে এর জীনগত পরিবর্তন হয়, ফলে সাধারণ ওষুধে কাজ করে না, দ্রুত সংক্রামিত হয়। মানুষের দেহে সংক্রামিত হয় হিমাগ্লুটিনিন্ জিনের মাধ্যমে। সাধারণ কফ্ ও হাঁচির মাধ্যমে এক পাখি থেকে অন্য পাখিতে শ্বাস প্রশ্বাসের মাধ্যমে এমনকি পাখির পালক থেকে কাঁচা মাংস, পাখির মল মূত্র ও জলের মাধ্যমে বাহিত হয়ে রোগটি ছড়াতে পারে। **(বার্ড ফ্লু আক্রান্ত মুরগী বা পোলট্রিদের চিকিৎসা না করিয়ে সরাসরি মেরে ফেলতে হবে (Culling) এবং মাটির নীচে ১০ ফুট গর্ত করে পুঁতে ফেলতে হবে। পরবর্তী ক্ষেত্রে জীবাণুনাশক দিয়ে পরিশোধন করতে হবে।)**

আক্রান্ত পাখির দেহে লক্ষণ কি ?

১) পাখির ঝুঁটি কাল্‌চে হয়ে যায়। ২) পালক উঠে যায় এবং পায়ে রক্তক্ষরণ দেখা যায়। ৩) জ্বর, কাঁপুনি, শ্বাসকষ্ট ও পেটের রোগ দেখা যায়। ৪) ক্ষুধা মান্দ্য। ৫) ২-৩ দিনের মধ্যে ব্যাপকহারে পাখিমারা যাবে। ৬) ডিম উৎপাদন কমে যাবে। ৭) বৃত্তাকারে পাখি ঘুরতে থাকবে। ৮) গলা ফুলে যাবে। ৯) নাক ও চোখ দিয়ে জল পড়বে।

আক্রান্ত মানুষের লক্ষণ কি ?

১) কন্‌জাংটি ভাইটিস বা চোখ লাল হয়ে যাবে। ২) ইনফ্লুয়েঞ্জার মতোই জ্বর কাশি, শ্বাসনালিতে সংক্রমণ, নিউমোনিয়া, ব্রঙ্কোনিউমোনিয়া, মাংসপেশীতে ভীষণ যন্ত্রণা, এছাড়া ও অন্যান্য জটিল উপসর্গ দেখা দেবে।

এই রোগের চিকিৎসা কি ?

রোগটি যেহেতু ভাইরাসঘটিত তাই এর নির্দিষ্ট কোন চিকিৎসা নেই। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা জানিয়েছেন কয়েকটি অ্যান্টি ভাইরাল ঔষধ এক্ষেত্রে কার্যকর। কোনো কোনো বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক জানিয়েছেন 'ট্যামি ফ্লু' ট্যাবলেট এই রোগকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। যদিও বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থা এখনো নিশ্চিতভাবে ঘোষণা করতে পারেনি যে রোগটি মহামারী আকার ধারণ করলে কি ধরনের ওষুধ প্রয়োগ করা হবে। ভারত সরকার এখনো পর্যন্ত আক্রান্ত অঞ্চলে 'Tamiflu-75 mg' ট্যাবলেট ব্যবহার করার নির্দেশ জারি করেছে।

বার্ড ফ্লুকে প্রতিরোধ করার জন্য যা যা করতে হবে—

১) ৩০ মিনিট ধরে ৭০° সেলসিয়াস তাপমাত্রায় সঠিকভাবে রান্না করলে এই ভাইরাসটি মারা যায়। যথাযথ ভাবে রান্না করা পোলট্রির মাংস ও ডিম যে সম্পূর্ণ নিরাপদ সে কথা জোর দিয়ে প্রচার করতে হবে। ২) অসুস্থ পাখি কিনবেন না বা রান্না করে খাবেন না। ৩) পোলট্রির কোন রকম অসুস্থতা বা অস্বাভাবিক মৃত্যু হার লক্ষ্য করলে স্থানীয় পশুচিকিৎসকের পরামর্শ নিতে হবে বা পশু হাসপাতালে নিয়ে যেতে হবে। ৪) পোলট্রির ঘর বা খামারজাত বর্জ্য পদার্থ নির্দিষ্ট স্থানে গর্ত করে ফেলতে হবে, বহিরাগতকে মুরগীর খামারে ঢুকতে দেওয়া নিষেধ। ৫) নিয়ম মাফিক মুরগী খামারে টীকাকরণ করতে হবে। ৬) মৃত পাখির ময়নাতদন্ত পশু হাসপাতালে অবশ্যই করাতে হবে। ৭) খামারে সবসময় জীবাণুনাশক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। ৮) কাটা মুরগির মাংস বাড়ীতে আনার পর ভালোভাবে ধুয়ে নিয়ে রান্না করতে হবে। ৯) কোন পরিযায়ী পাখি মারা গেলে সেটিকে সংগ্রহ করে সরকারী পরীক্ষাগারে পাঠাতে হবে (সিল করে) । ৯) খামারে এক বয়সী নীতি (All-in-all-out) গ্রহণ করতে হবে।

বার্ড ফ্লু আতঙ্কে যেভাবে রাজ্য জুড়ে মুরগি নিধনের কাজ চলছে সেটি অবিলম্বে বন্ধ করতে হবে। শুধুমাত্র বার্ড ফ্লুতে আক্রান্ত পোলট্রিদের চিকিৎসা না করিয়ে দ্রুত মেরে ১০ ফুট নিচে গর্ত করে পুঁতে দিতে হবে।

বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থা প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে জানিয়েছেন যে এশিয়ায় বার্ডফ্লু যে কোন সময়ে মহামারীর রূপ নিতে পারে। বিশেষজ্ঞরা আগাম প্রতিরোধক ব্যবস্থা নিতে বলেছেন। এইচ ৫ এন ১ (H_5N_1) ভাইরাস ঘটিত বার্ডফ্লু-এর প্রতিষেধক টিকা তৈরির জন্য গবেষণা চালাচ্ছেন ব্রিটেন, ইতালি, চিন, নরওয়ে সহ বিভিন্ন দেশের বিশেষজ্ঞরা। বিজ্ঞানীরা আশঙ্কা করছেন যে কোন সময়ে মানুষের শরীরে এই রোগ ছড়িয়ে পড়তে পারে। সেই জন্য এই ভাইরাস এর মোকাবিলায় তৈরি হচ্ছে হিউম্যান ক্যানডিডেট ভ্যাক্সিন। আমাদের আশা বিজ্ঞানীদের অক্লান্ত পরিশ্রমে ও গবেষণার ফলে শীঘ্রই বার্ড ফ্লু-এর প্রতিষেধক আমরা পেয়ে যাবো।

— *নিজস্ব প্রতিনিধি*

যোগাযোগ : বিজ্ঞান দরবার, ৫৮৫, অজয় ব্যানার্জি রোড, পো: কাঁচরাপাড়া- ৭৪৩১৪৫, উ: ২৪ প:। ফোন : ০৩৩-২৮৭৬০৭২০, ২৫৮০-৮৮১৬, ৯৪৭৪৩৩০০৯২ ।
সম্পাদক মণ্ডলী— সুরজিৎ পাল, পান্নালাল মান্নি (সহ সম্পাদক), শমিত কর্মকার, বিজয় সরকার, সুরজিৎ দাস, সলিল কুমার শেঠ।

স্বত্বাধিকারী ও প্রকাশক জয়দেব দে কর্তৃক ৫৮৫ অজয় ব্যানার্জী রোড (বিনোদ নগর) পোঃ কাঁচরাপাড়া, পিন-৭৪৩১৪৫, জেলা- উত্তর২৪পরগণা থেকে প্রকাশিত এবং তৎকর্তৃক স্ক্রীন আর্ট, ২০ নেতাজী সুভাষ পথ, পোঃ কাঁচরাপাড়া, জেলা- উত্তর ২৪পরগণা থেকে মুদ্রিত ।
সম্পাদক— শিবপ্রসাদ সরদার। *(ফোন : ৯৪৩৩৩৩৪৩৮০)* **E.mail-** ganabijnan@yahoo.co.in.